Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

কথাসাহিত্যিক গণেশ দে'র গল্পে মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনালেখ্য নিবিড় পাঠ ও বহুমাত্রিকতার অনুসন্ধান

সঙ্গীতা সাহা

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/13_Sangita-Saha.pdf

সারসংক্ষেপ: জীবনের অসংখ্য বুদবুদের কথাকার হলেন অসমের বরাক উপত্যকার সাহিত্যিক গণেশ দে। শিলচরের অদূরবর্তী লক্ষ্মীপুরের নিম্নবিত্ত পরিবারে ১৯৪১ সালে জন্ম গণেশ দে'র। তাঁর শৈশব ও যৌবন কেটেছে শিলচরে। দেশভাগ, অনুপ্রবেশ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিভিন্নতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে ভারতীয় সীমানায় ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁষে থাকা অসম নানা কারণে দেশের অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক এবং ভিন্নতার সেই রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন সংগ্রামের। অসমের চা বাগিচার সবুজ সৌন্দর্যের রূপে মুগ্ধ হই সকলে, অথচ তার পিছন দিকে তাকালে দেখা যাবে চা বাগানের শ্রমিকের অমানুষিক পরিশ্রমের, স্বল্প মজুরি, মালিকের সঙ্গো সংঘাত, যৌন শোষণ এবং ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের নানান স্তর। আর এই যাপনের নানান রূপ, স্তরভেদে মানুষের কথা সাহিত্যের আসরে নিয়ে এসেছেন যারা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাহিত্যিক গণেশ দে। তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'অশ্লীল', 'সম্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে লিখেছেন 'ঘাম', 'অশ্রু ও দূরের বাঁশি', 'অজানাই রয়ে গেছে', 'আগুন দিয়ে লেখা', 'হাতে বাখারি', 'দাঁতে বিষ', 'সেফটিফিন', 'অঞ্জু তবুও নীরব', 'সেগুন কাঠের পালঙ্ক'এর মতো গল্প। অসমের চা শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম থেকে মধ্যবিত্তের দিনযাপনের কাহিনি নিয়ে গল্প লেখা, বর্তমান আলোচনায় তাঁর গল্পের বহুবিস্তৃত পরিধির সীমা নির্ধারণ না হোক সেই পরিধি পরিক্রমার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: গণেশ দে, বরাক উপত্যকা, অসমের চা শ্রমিক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মধ্যবিত্ত জীবন সংগ্রাম

১

জীবনের অসংখ্য বুদবুদের কথাকার হলেন অসমের বরাক উপত্যকার সাহিত্যিক গণেশ দে। শিলচরের অদূরবর্তী লক্ষ্মীপুরের নিম্নবিত্ত পরিবারে ১৯৪১ সালে জন্ম গণেশ দে'র। তাঁর শৈশব ও যৌবন কেটেছে শিলচরে। পড়াশোনা শিলচরের জি সি কলেজ থেকে। পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬৯ সালে লক্ষ্মীপুরের পার্শ্ববর্তী পয়লা পুল নেহেরু কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। শৈশব-কৈশোর-যৌবন কেটেছে আর্থিক অসচ্ছলতায়। প্রতিকূলতার সঙ্গো হাসিমুখে লড়াই করতে করতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সদাহাস্যময় এই মানুষটি যেকোনো বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পারিবারিক জীবনের সুখ তাঁর সৃষ্টির অন্তঃস্থলে ইতিবাচক জমিন নির্মাণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় পরীক্ষার ফী দেওয়ার জন্য চার বন্ধু মিলে গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হয় এবং ভাগ্যবিধাতাও যেন স্মিতমুখে সরস্বতীর বরপুত্র হিসাবে কথাকার গণেশ দে'কে স্বীকৃতি দিলেন। জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের নানা অভিজ্ঞতা অনুভূতির জারকে মিশে ১৯৬৫ - ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর অব্যাহত থেকেছে তাঁর কলম।

১৯৬০-৬১ সালে বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের তরুণ কবি হিসাবে গণেশ দে 'রুদ্র বিষাণ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন একগুচ্ছ কবিতা। কিন্তু খুব বেশিদিন কবিতার জগতে তিনি আবদ্ধ থাকেননি। গণেশ দে নিজেই তাঁর গল্প লেখার সম্পর্কে 'কেন গল্প লিখি', 'শারদীয়া', 'অনির্বাণ শিখা' ৯৭বাং, পৃষ্ঠা-৪০এ জানিয়েছেন : "আমি গল্প লেখা শুরু করি বরাক উপত্যকায় ছোটোগল্পের ধারাটাকে পুষ্ট করার চেষ্টায়। চোখের

সামনে কোনো ঘটনা ঘটতে দেখলে আমার মনে হয় এটা তো অন্যরকম পরিণতি পেতে পারতো, যা আমাদের কাম্য, যা প্রার্থিত। তখনই গল্প লেখার প্রেরণা পাই।... সর্বোপরি আমি গল্পের জন্য গল্প লিখি না। চাবুক আর তুলিকে এক করে আমি গল্প লিখি — জীবনের জন্যে।" সেজন্যই যেন শিলচরের 'কবির শহর' তকমা ঘোচাতে ঝোঁকের বশে প্রকাশ করেছিলেন 'শনিবার বিকেল' নামে এক গল্প পত্রিকা। এই পত্রিকার স্লোগান ছিল — "কাছাড়ে ধানের চেয়ে কবিতার ফলন বেশি। এবার কিছু গল্প চাই — গল্প লিখুন।"[১] তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর সেই পত্রিকার সমাধি হলেও লেখকের গল্প লেখা থামেনি। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতরমহল ও বারমহলের ব্যবধানকে তিনি চিনে ফেলেছেন ততদিনে। তাই জনগোষ্ঠীর প্রাণরসে পুষ্ট হয়েছে তাঁর গল্প-কথকতা।

২

মানুষের গোটা জীবন কখনোই পৌষ পার্বণ হয় না। বরং বলা যায় এ জীবনের ভাঁজগুলো সংকীর্ণ ও ছিন্নমূল, নানা কারণে কখন যেন 'বেঁচে থাকা' হয়ে যায় 'টিকে থাকা'র নামান্তর। দস্তুরমতো নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ঘর করে জীবনবৃত্তের শরিক মানুষগুলো শুষ্ক মুখে শুধু 'নিমক রোটি' চিবোয়। আর অঞ্চলভেদে জীবনযাত্রা কমবেশি পৃথক হলেও মানুষের অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, জীবন সংগ্রাম প্রায় একই রকম থাকে। কেবল রকমফের ঘটে জীবন সংগ্রামের চরিত্রে আর মাত্রায়। ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করে সমাজ পরিসরের প্রান্তিক সীমায় যাদের বাস তাদের অবস্থান বাংলা-উড়িষ্যা-অসম কিংবা কাশ্মীর অথবা দেশের যে সীমানাই হোক না কেন জীবনের সঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণে তাদের মুখে পড়ে মলিনতার ছাপ, আবার অনেক সময় সেই মলিন মুখেই দেখা যায় প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ আলো। দেশভাগ, অনুপ্রবেশ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিভিন্নতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে ভারতীয় সীমানায় ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁষে থাকা অসম নানা কারণে দেশের অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক এবং ভিন্নতর, সেই রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন সংগ্রামের। অসমের চা বাগিচার সবুজ সৌন্দর্যের রূপে মুগ্ধ হই সকলে অথচ তার পিছন দিকে তাকালে দেখা যাবে চা বাগানের শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম, স্বল্প মজুরি, মালিকের সঙ্গে সংঘাত, যৌন শোষণ এবং ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের নানান স্তর। আর এই যাপনের নানান রূপ, স্তরভেদে মানুষের কথা সাহিত্যের আসরে নিয়ে এসেছেন যারা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাহিত্যিক গণেশ দে। গণেশ দে'র গল্প বলার মেজাজ অনেকটা বৈঠকী আলাপচারিতায়। যেন বহু দিনের অভিজ্ঞতা ঝাঁপি নিয়ে বসেছেন গল্প শোনাবেন বলে। লেখনশৈলী এতই সহজ এবং মৃদু অথচ দ্রুত সঞ্চরণশীল যে কোথাও থমকাতে হয় না। তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী 'গল্পসমগ্রে'র কথামুখে লিখেছেন —

> "আখ্যানভাগ মোটেই জটিল নয়, যেন কোন সমস্যা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে গল্পের চরিত্রগুলো কখনও স্মৃতিকাতর, কখনও প্রেমে, কখনও বিরহে আচ্ছন্ন, আবার কখনও সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা থেকে উঠে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছে; যেমন 'কাঁটা', 'মাভৈঃ! মণিময়!', 'ঘাম, অশ্রু ও দূরের বাঁশি', 'অজানাই রয়ে গেছে', 'আগুন দিয়ে লেখা', 'হাতে বাখারি, দাঁতে বিষ', 'সেফটিপিন', 'অঞ্জু তবুও নীরব', 'সেগুন কাঠের পালঙ্ক'"[২]

তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'অশ্লীল', 'সম্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গল্প-সংকলন 'নীলগোলাপ'এর আত্মপ্রকাশ। এটি গণেশ দে, কালীকুসুম চৌধুরী, কিরণশঙ্কর মহন্ত এবং চিরঞ্জীব চৌধুরীর দুটো করে মোট আটটি গল্পের একটি অপূর্ব সংকলন। প্রখর বাস্তব জ্ঞান, ইতিহাসবোধ এবং বামপন্থী মতাদর্শের শরিক হয়ে জনজীবনের কাছাকাছি বাস করেছেন আজীবন। তাঁর অধ্যাপক জীবনের অবসর কিংবা অনবসর সময়ে মানুষের পাশে থাকায় ভাটা পড়েনি। পাশে থেকেছেন বহির্বাস্তবের মাটিতে, মেধায় ও অন্তরে; যার পরিচয় পাওয়া যায় 'বন্দরে ফেরা', 'অজানাই রয়ে গেছে', 'সিকমানিয়া', 'পিছল মাটি', 'নিখাদ সোনা', 'নাকছাবির আকাশে'র মতো গল্পে।

'সিকমানিয়া' গল্পে 'যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজ। কোমর সমান চা-গাছের গালিচা আর মাঝে মাঝে শিরীষ প্রহরী'[৩] এই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশের ভেতরে চা বাগানের সাহেবের আদিম প্রবৃত্তি ও যৌন শোষণের

নখদন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভেঙে খানখান করে দেয়। অবিবাহিত ছটো সাহেবের লালসা মাখা চোখে উনিশ বিশের যুবতী শরীরে ধরা দেয় সিকমানিয়া। বনের সহজ-সরল মেয়ে জানে না মিথ্যে কথা বলা লোকগুলোর সমাজ কত জটিল, কত ভেদ, কত লোভ লালসা ধূর্ততার চোরাবালিতে বাস করে এই শিক্ষিত সভ্য মানুষেরা। তাই সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল সাহেব তাকে ভালোবাসে কিন্তু আসলে তো সে ছটো সাহেবের অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র। ফলে বোকা মেয়েটির ভালোবাসার শেষ স্বীকৃতি দেখা যায় ওর বাহু ও পিঠের লাল রক্তের রেখাতে, যেখানে সাহেবের হাতের ছড়িটা কেটে বসে গিয়েছিল। চা বাগানের সবুজ সুন্দরের মাঝে সিকমানিয়াদের ভালোবাসার হত্যা আমাদের পিঠে চাবুকের মতো এসে বাজে। এরকমি আরো একটি গল্প 'বুড়োটা'য় নামহীন এক সরকারি কেরানির একদিনের জন্য রাজার রাজা বনে যাওয়ার নির্মম পরিণতি ঘটে বড়ো সাহেবের নিষ্ঠুরতায়। এখানেও ঊর্ধ্বতন সাহেব অধঃস্তন কর্মচারীর শুধু অন্নবস্ত্রের সংস্থাপক নন তিনি যেন ক্রীতদাস করে ফেলেছেন নিজের দপ্তরের কর্মীকে। বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক অহংবোধে বড়ো সাহেব ছটো ছটো কর্মীদের জীবনযাপনের মনিব। তার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু তলার এই কর্মী বিড়ি জ্বালানোরও সাহস পান না। শেষ বয়সে এসে তিনি উপরওয়ালা সাহেবের কাছে মাথা নত করে আরো এক বছর চাকরি এক্সটেনশনের তদবির করেন। সংসারে অভাব তার নিত্য সঙ্গী। সিকমানিয়ার মতো এ গল্পেও পৃথিবীর সদর দরজা বন্ধ হয়ে যায় দপ্তরের বর্ষিয়ান ওই কর্মীর সামনে, এখানেও নির্দয় উপরওয়ালা মনিব দ্বিধা করেন না নিচের কর্মীর শ্বাসবায়ু রোধ করতে। তাদের মনে শুধুই ঘৃণা আর প্রভু সুলভ নির্মমতা। দুটি গল্পেই মনিবের দুই রকম শোষণের ছবি, একটিতে যৌন লালসা রিরংসা, মিথ্যাচার, আর দ্বিতীয়টিতে দরিদ্রের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ। 'বুড়োটা' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের আপাত সচল ছবির আড়ালে ঘুণ ধরা, আর্থিক অনটনে পর্যুদস্ত বাস্তব সত্য প্রকাশ করেছেন লেখক। আলোচ্য গল্পে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সরকারি দপ্তরের এই বৃদ্ধ। তার ছেলে শিলং পুলিশ বাজারের মস্তান, উপার্জনের পরিবর্তে খরচের দিকেই তার মন। অথচ এই বাড়িতেই জামাই আসার খবর পেলে কুড়ি টাকা দিয়ে বাজার করতে যেতে হয় কারণ মান সম্মান বড়ো বালাই। গণেশ দে'র কথকতার আসর অনায়াসে সমাজের নানান স্তরে অনায়াসে বিচরণ করে। সব রকমের মানুষের ভিড় দেখা যাবে তাঁর গল্পে। অর্থবান ক্ষমতালোভী থেকে মধ্যবিত্ত সংসার কিংবা প্রান্তিক শ্রমিকগোষ্ঠির অনাহারে রাত্রিযাপন কিছুই তাঁর কাছে অপাংক্তেয় নয়। সমান মমতায় তিনি জীবনকে দেখেছেন। তাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং পাঠকের ভাবনায় তরঙ্গ তোলার সার্থক চেষ্টা করেছেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'আমাদের সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অবশেষে একদিন' গল্পে বড়ো সাহেবের শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলতে দেখা যায় সব সময়ের নীরব কর্মচারী মঙ্গালকে। বৈঠকী মর্জিতে এগিয়ে চলা কথনশৈলী একটার পর একটা দিনের বর্ণনায় নিয়মিত বেতনের মূল্যে মঙ্গালের বিবেকবর্জিত নীরব দাসে পরিণত হওয়ার মধ্যেও প্রতিবাদের শলাকা জাগিয়ে রাখে। মঙ্গাল আর বড়ো সাহেব রমানাথের নিরুদ্বিগ্ন সম্পর্ক হঠাৎই এক অভাবনীয় সমাপতনে পরিণতি পায়। লেখকের মুন্সিয়ানা পাঠকের উত্তেজনা ধরে রাখতে পারে গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত। ভুখা মিছিলের দিকে ভোজালি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া মঙ্গালের হাতে তার পিতার নিথর দেহ লুটিয়ে পড়লে তাঁর সম্বিৎ ফেরে। মনে মনে ভুখা জোয়ান মদ্দদের খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে সাহেবের কাছে ভিক্ষা করতে দেখে মঙ্গাল নির্মম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পিতৃহত্যার নিদারুণ শোক বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে দেয়, মঙ্গাল তখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এতদিনের চাপা ক্ষোভ নিয়ে মরণ আঘাত হানে বড়ো সাহেবের উপর। তার হাতে লুটিয়ে পড়ে আরেকটি দেহ। আর এই সমাপতনে লেখক শোনান দরদী সাহেবের ভাড়াটে লেখকের তৈরি করা মরমি ভাষণের দুই পংক্তি —

"সমস্ত অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে একদিন এইসব অসহায় মানুষ রুখে দাঁড়াবেই। সেদিন আজকের অত্যাচারীকে দিতে হবেই শেষ জবাব... "[৪]

এই হত্যার বকলমে মঙ্গালের প্রতিবাদকে সচেতন প্রতিবাদ বলা যায় না ঠিকই, তবে তার মনে বড়ো সাহেবের অত্যাচার ও শোষণের নগ্নরূপ অচেনা ছিল না। রুটি রুজির দামে সে কেবল নীরব ছিল, কিন্তু বিকিয়ে

যায়নি। আর সেই নীরবতা ভেঙে পড়ল পিতৃহত্যার প্রেক্ষাপটে। এই গল্পে অর্থবান মানুষের শুধু অন্যের শ্রম নয় মেধা কিনে ফেলারও ইঙ্গিত দিয়েছেন গণেশ দে। বড়ো সাহেবের প্রয়োজন দরিদ্র জন দরদী সভায় বলার মতো একটি চমৎকার ভাষণের। তিনি শরণ নেন টাকা আর ঠাণ্ডা বিলেতি নেশা পানীয়ের। যার বিনিময়ে তিনি পেয়ে যাবেন ভাড়াটে লেখক। বড়ো সাহেব গাড়ির চালক গফুরের পারিবারিক বিপদে সহানুভূতির বদলে হুকুম জারি করেন সেদিনই তাকে পৌঁছে দিতে হবে শহরে, কারণ সেখানে অপেক্ষা করছে নতুন বিনোদন। এমন করে প্রত্যেক বার গণেশ দে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের পরত উন্মোচন করেন একের পর এক গল্পে। অর্থের পরিচয় যাদের কাছে একমাত্র মনুষ্যত্বের প্রমাণ তাদেরই শরিক 'সেগুন কাঠের পালঙ্ক' গল্পের মি. সাহা। বড়ো বাড়ির শূন্যস্থান পূরণ করতে তিনি বনেদি ঘরের জিনিস কিনতে আগ্রহী। আর পড়তি আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে বিভাস ঠাকুরদার মায়ের খাটটি বিক্রি করে শহরে যেতে চায় জীবিকার আশায়। তার মনেও বনেদি পূর্ব পুরুষের প্রতি ব্যঙ্গা ঝরে পড়ে। আর এই সময়েই বিভাসের হাতে আসে বংশের কুলজি পুস্তক, এই বইয়ের বংশধরের স্বাধীন জীবিকার প্রার্থনায় শেষ হওয়া একটি চিঠিতে বিধাতার কাছে তার ঠাকুরদার মায়ের আবেদন —

"আমার মণি যেন দীর্ঘজীবী হয়... তাহার বংশের কেউ যেন চাকর না হয়।... আমার মণি এবং তাহার বংশধরেরা যেন সেগুন কাঠের পালঙ্কে রাজার মতো শুইয়া কাল কাটায়"[৫]

এই আবেদন স্বয়ং লেখকেরও। তিনিও চান এদেশের মানুষ যেন কারো চাকর না হয়, ক্ষুণ্ণিবৃত্তির ব্যবস্থায় যেন তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে না যায়, তাদের মাথা যেন নত না হয়। তাই বিভাসের আত্মবোধের জাগরণ ঘটে এবং সে স্থির করে স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করবে। 'ললাটে দেয়াল লিখন'এর চরিত্র কুন্তলের মতো জীবিকার টানে ছিন্নমূল হবে না সে। অবশ্য বিভাসের ছিল বনেদি অবস্থাপন্ন ঘরের স্মৃতি পুস্তক কুলজি গ্রন্থ, ছিল পূর্বপুরুষের কীর্তিময় ইতিহাস। কুন্তলের সেসব কিছুই ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল গ্রাসাচ্ছাদনের জরুরি প্রয়োজন। আর তার সেই প্রয়োজনের গ্রাসটি তুলে নেয় অকারণে শৌখিন চাকরি করতে চাওয়া ধনী কন্যা জয়ন্তী। সেই জয়ন্তীই পরে চিনতে পেরে ভাবে কুন্তল কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে শেষ পর্যন্ত এলো মাস্টাররোল ঠ্যাঙাতে। এর উত্তর জয়ন্তী হয়তো পেল না কিন্তু পাঠক দেখতে পেলেন খিদের তাড়নায় সারাদিনের খাটুনির পর কুন্তল বাসি রুটি গিলছে আর মেনে নিয়েছে ললাটে দেয়াল লিখন — অন্ন চাই, বস্ত্র চাই।

৩

দুর্নীতি, শোষণ আর বঞ্চনার মুখে দাঁড়িয়ে কেউ নিজের ভাগ্য লিপি নীরবে মেনে নেয়, কেউ বা সরব প্রতিবাদ করে আবার কেউ কেউ নিঃশব্দে জীবন থেকে বিদায় নিয়ে পার করে যায় মৃত্যুর চৌকাঠ। এদের কারোরই জীবনতৃষ্ণা কিছু কম নেই, কেউই অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজের জীবনে জলসাঘরের ঝাড়বাতি জ্বালাতে চায়নি; তবু তাদের জীবন প্রদীপ জ্বলে উঠে না বরং নিভে যায় দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাবানের প্রভাবে। গণেশ দে এমনি প্রায় নাম-গোত্রহীন সমাজের চোখে ব্যর্থ মানুষের দিন গুজরানের জীবনবেদ তুলে ধরেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সাময়িকীতে। যেসব সাময়িকীর আধুনিক পাঠক নিজ নিজ বৃত্তে দাঁড়িয়ে হয়তো কল্পনাও করতে পারে না সরকারি দপ্তরের অধঃস্তন কর্মীর যন্ত্রণা, চা বাগানের শ্রমিকের প্রতি মালিকের শোষণের মাত্রা, মেয়েদের প্রতি উপরমহলের লালসার চোখ রাঙানি কিংবা অতি সাধারণ রিক্সাওয়ালার নেশায় বুঁদ হওয়ার পিছনের হিমশৈল পরিমাণ দুঃখের হাতছানি। সুখের সন্ধান আমরা সকলে করি কিন্তু সুখের জাদু কাঠের বদলে হাতে আসে না-পাওয়ার বেদনা। 'অতি সাধারণ এক কাহিনি' গল্পে এমন পরিণতিই ঘটে কালাচাঁদ ওরফে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর জীবনে। চণ্ডীপুর গ্রামের দরিদ্র ঘরের সন্তান চন্দ্রশেখর পাশ দেবে, শিক্ষার আলো বুকে নিয়ে উঁচুতলায় উঠবে – তাও আবার হয় নাকি! গ্রামের রাজনীতি নিচু মানসিকতা যথার্থরূপে অশ্লীল, জঘন্য বাস্তব। তারই শিকার চন্দ্রশেখর। শহরে এসে দোরে দোরে ঘুরেও চাকরি পায়নি সে। তাই বাধ্য হয়ে রিকশা চালাতে হয়। চন্দ্রশেখর পরিণত হয় কালাচাঁদে। অফিসের বড়োবাবু মনোময় অবসর সময়ে লেখালেখি করেন। গভীর

রাতে তিনি হয়ে ওঠেন জীবনসন্ধানী, মেশেন সাধারণ রিক্সাওয়ালা খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে মদ খান, শোনেন তাদের বিগত জীবনের গল্প। আলোচ্য কাহিনিতে মনোময় নিজের অজান্তে কালাচাঁদের জীবনে ভিলেন হয়ে যান। একটি চাকরির দরখাস্ত নাকচ করে দিয়ে সেদিন রাতেই শোনেন ওই চাকরির উমেদার কালাচাঁদ একদিন চণ্ডীপুরের মাঠে জামরুল গাছের নিচে চামেলিকে স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছিল। আজ সে ব্যর্থ, চামেলিও ছিটকে পড়েছে স্বাভাবিক জীবন থেকে বারবনিতাদের অন্ধগলিতে। নারীত্বকে সতীত্বের উপর স্থান দিতে হয়তো পারত না কালাচাঁদ। ভাগ্যের পরিহাসে জীবনের প্রতি ক্ষোভ থেকে মদ্যপ অবস্থায় আত্মহত্যার মধ্যে নিভে যায় আরেকটি জীবন। এ গল্পে কালাচাঁদের ব্যর্থ প্রেম কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আর এক কালাচাঁদের কথা। আমরা চিনি সেই কালাচাঁদকে যিনি কংস বধের জন্য দ্বারকা গিয়ে আর ফেরেননি। পিছনে রাধারানী গুমরে মরেছে মন বৃন্দাবনে বাঁশি শুনে পাগলিনী হয়েছে। আর তাদের গান গেয়ে শত বৎসর ধরে মেতেছে আপামর বাঙালি। বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ রাধাকে ভুলেছেন কিন্তু নতুন এই গল্পে কালাচাঁদ ভোলেনি তার রাধারানীকে। চামেলিকে ঘিরেই তার স্বপ্ন ছিল। রাজ্য নয় সে চেয়েছিল একটি পিয়নের চাকরি। তাহলেই জুটত সসাগরা রাজ্য যেন। কিন্তু তাও হলো না। তারা ছিটকে গেল একে অপরের থেকে, জীবনের রুক্ষতায় কালাচাঁদ চামেলির জীবন জোড়া লাগলো না। পৃথিবীর কত নষ্ট ফসল জীবনের যন্ত্রণা দেখতে দেখতে এমন কত হেমন্ত চলে যায়। বাস্তবে এমন ঘটনা বিশ্ব সংসারে অতি সাধারণ। চাকরির বাজারের স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, অন্তর্কলহে মানুষ ছিটকে যাচ্ছে অন্নসংস্থানের আশায় মূল স্রোত থেকে দূরে; ফলে তাদের জীবন আর প্রেয়সীর নাগাল পায় না। ভেসে যায় জীবন যৌবন অন্ধকার চোরাস্রোতে। যে স্রোতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক জানান অঞ্চল ও শ্রেণি ভেদে যন্ত্রণা পাল্টায় না, মানুষের অনুভূতি ও প্রেম একই রকম। বর্তমানের বেসুরো সময়ে শিক্ষা, সততা যখন সমাজের বুক থেকে বিদায় নিয়েছে প্রায়, সেই চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আজকের পাঠক গণেশ দে'র গল্পে খুঁজে পান কঠিন বাস্তব।

আবার সব ক্ষেত্রেই যে বহির্জগতের ষড়যন্ত্র মানুষের জীবনে শত্রু হয়ে দেখা দেয় তা নয়। অনেক সময় চরিত্র নিজেই নিজের সর্বনাশ করে তারপর কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে কাচের গ্লাস ভেঙে গেলে তার সম্বিৎ ফেরে। 'নীলগোলাপ' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'বন্দরে ফেরা' কাহিনির মূল চরিত্র অনেক অনেক উজ্জ্বল কর্মের নায়ক হওয়ার সাধে প্রথম যৌবনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে যায় শহরে। ছোটবেলা থেকেই তার দেহের রক্তে বিদ্রোহ জমাট বেঁধেছিল। খেতে না পাওয়ার পুঞ্জিভূত রাগ গিয়ে পড়ত ক্ষমতাসীন সরকারের উপর। বুঝতে পারত সরকারের চোখে চতুর্থ শ্রেণি যেন মানুষ না। যোগ বিয়োগের জটিল অংক শেষে গল্পের নায়ক যখন রাজনৈতিক কর্মী তখন আবারও তাকে একবার ফিরে আসতে হয় নিজের গ্রামে। এ গল্পে রয়েছে রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিজীবন, রাজনীতির আবেগ ও ভণ্ডামি, আর রয়েছে নরম শয্যার সামনে বুভুক্ষু রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর পাল্টে যাওয়ার বিবরণ। তারপর যখন মনে পড়ে 'গ্লাস ভাঙার তরল শব্দ' তখন ফেলে আসা প্রেমের টানে ছুটে যেতে হয় নষ্ট মেয়ে মানুষ কাজললতার কাছে। এক বিন্দুতে দুজন দাঁড়িয়ে কেউ আর উঁচু-নিচু নয়, দুজনেই সমান। পার্টিকর্মীর মানসিক টানাপোড়েন ও জীবনের প্রতি লেখকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এই গল্পের প্রাণ। ভাষার সুষমা মিশ্রিত পথে চরিত্রের জীবনের চাকা পৌঁছেছে তার লক্ষ্যে, তাই পাঠক পেয়েছেন নিষ্প্রাণ ভাঁড়ামির মধ্যেও ইতিবাচক পরিণতি। আসলে তো 'জীবন তেমনি, যেমন বাঁচবে তুমি' তাই শেষ অবধি নস্টালজিয়া নয়, মরবিডিটি নয়, তিলে তিলে মরা নয় 'বর্তমানের রুমালে জড়াতে হবে জীবনের নতুন গন্ধ' যে গন্ধে প্রেম থাকবে, প্রিয়জনের হাতের স্পর্শ থাকবে আর থাকবে রাশি পরিমাণ আলোর হাতছানি।

লেখকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার সচেতন মনকে আঘাত করতে থাকে অবিরত। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা-সংঘাত-সময়ের দ্বন্দ্ব গণেশ দে'র মতো ধীশক্তি সম্পন্ন লেখকের মনে দাগ কাটে। তাঁর সৃষ্টিতে তখন সময়ের অভিজ্ঞান, রাষ্ট্রিক চেতনা ও ইতিহাসবোধের বহুমাত্রিক বর্ণ বিচ্ছুরণ ঘটে। সচেতন লেখক নিজস্ব ক্ষুন্নিবৃত্তির দায় স্বীকার করেও প্রলয়কালে উটের মতো চোখ বন্ধ করে স্বপ্নরাজ্যে স্বেচ্ছাবসর নিতে পারেন না। তাঁকে সৃষ্টিকর্তার দায়িত্ব বা সাহিত্যের ন্যায়বিচারকে স্বীকার করতে হয়। ক্ষুধার উঞ্ছবৃত্তিকে ছাপিয়ে 'বোধ'

তাকে দিয়ে লেখায় সমাজ ইতিহাসের দলিল। ক্ষমতাবান মুনাফাবাজের করাল গ্রাসের মাঝে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে নিম্নবিত্তের যন্ত্রণা আর মধ্যবিত্তের অভিযোজনের নোনতা স্বাদ তার কলমে এসে গেঁথে যায়। ক্ষতবিক্ষত হয় লেখকের হৃদয়। ফলে ধনী ঘরের কেচ্ছা আর ব্যভিচারের রগরগে গল্প লিখতে শুরু করেও শেষ করা হয় না। কলমের নিবে লেখা তখন আপনি আপন রাস্তা তৈরি করে। আসলে লেখক তো কখনো পেটি বুর্জোয়া কাছে বিকিয়ে যেতে পারেন না। তিনি যে মতাদর্শেরই হন না কেন শেষ অবধি তিনি তো মানবজমিনের কাছে বাঁধা। তাই বারোয়ারি কাগজের ফরমায়েশি লেখা ছেড়ে শরতের ঢাকের দমাদম বাজনা লেখকের চেতনা জাগরণের প্রতীক হয়ে যায় 'সূর্যেরা নিভে যাচ্ছে'র আখ্যানবৃত্তে। এ গল্পে লেখক নির্মল আর পারে না সৌরিন বাসবীর অবৈধ সম্পর্ককে কাগজের পাতায় দাঁড় করাতে। তার চোখে ভাসে 'ভুখা মিছিলের' দাবি — 'চাল চাই, খাদ্য চাই, জিনিসের দাম কমানো চাই'[৬]। নির্মলের বকলমে লেখক নিজেই আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। গল্প লেখার জন্য তিনি যে গল্প লেখেন না সে কথা তিনি 'কেন গল্প লিখি'— তার মধ্যেই বলেছেন, যে উদ্ধৃতি আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। তাই গণেশ দে'র বিভিন্ন গল্পে বারবার ক্ষুধিতের কান্না, কারখানার শ্রমিক চা বাগানের অর্ধাহারে থাকা শ্রমিকের কথা ফিরে ফিরে আসে। মধ্যবিত্তের মোটামুটি সুদৃশ্য জীবনের আড়ালে তার ঘুণ ধরা ফাঁপা জীবন, বাজারের ব্যাগ বয়ে চলা মূল্যবৃদ্ধির হারে ন্যুব্জ বৃদ্ধের পদক্ষেপ কিছুই তার চোখের আড়াল হয়নি। একই কারণে 'পিছল মাটি'র মতো গল্পে অসৎ মহাজনের কারসাজিতে কেতুচরণের জমি বেহাত হওয়ার মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেন। শ্রাবণ মাসে বীজ রোপণের কালে ভাগচাষী কেতুচরণ জমির মালিকের প্রিয় পাত্র, আর সেইরূপ বদলে যায় অগ্রহায়ণ মাসে যখন ফসল কাটার সময় আসে। অপুষ্টি অনাহারে সঙ্গো নিত্য বাস করে কেতুচরণ ভাবতেও পারে না তার অবস্থার প্রতিকার হবে কোনোদিন। খিদের মুখে কটুগন্ধী চালের ভাত গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে, তারপর যখন খেয়াল হয় তখন ছেলে গোপালের ক্ষুধিত শুষ্ক মুখের পানে চেয়ে সে লজ্জিত হয়। 'যাদের জমি নেই রাজা তাদের জমি দেবে'— এ স্বপ্ন যারা দেখিয়েছিল আর যারা আশায় বুক বেঁধেছিল তারা সকলেই আজ বিলুপ্ত তাই পিছল মাটি সাঁতরে কেতুচরণের মতো ভাগ চাষীরা ভাঙা স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে।

৪

গণেশ দে'র লেখা 'অ্যাক্সিডেন্ট' একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। প্রথাগত মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার সম্পর্ক ও জীবনের সমীকরণ পরিশীলিত সমাজের মানসিকতার সীমা পেরিয়ে সমাজের প্রান্তিক পরিসরে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে, আলোচ্য গল্পটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'অ্যাক্সিডেন্ট' গল্পের বিপরীতে লেখকের 'কাঁটা' নামের গল্পটি রাখলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার বোঝা সম্ভব। অপেক্ষাকৃত অর্থসংগতি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে বিবাহ প্রসঙ্গো প্রেম একমাত্র শর্ত নয়। সেখানে রাশিচক্র না মিললে দীর্ঘদিনের সম্পর্কে ব্যবধান তৈরি হয়, যেমনটা দেখা যায় গল্পে অনুপম আর ভারতীর জীবনে। কুসংস্কারের পায়ে প্রেম সেখানে অপাংক্তেয়। ছোট্ট এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কত সহজে সম্পর্ক ভেঙে যায়। নতুন দাম্পত্যের সুখে মশগুল অনুপম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পুরনো ভাঙা সম্পর্কের কাঁটা নিজের জীবন থেকে তুলে ফেললেও শেষ রক্ষা হয় না। জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে চিতল মাছের কাঁটা গলায় আটকে গেলে ডাঃ ভারতী অনুপমকে সুস্থ করে। কিন্তু অনুপমের স্ত্রী সীমার বুকে অবিশ্বাসের কাঁটা সারা জীবনের মতো আটকে গেল। অন্যদিকে 'অ্যাক্সিডেন্ট' গল্পে দেখা যায় বিপরীত ছবি। রেল দুর্ঘটনায় লাভবান হয়ে শশীন্দ্র ও বিলাসী নতুন জীবন পায়। এই লাভবান হওয়ার মূল্য দিতে হয় বিলাসীর আঠারো বছরের নরমাংসে অ্যাক্সিডেন্টে আহত হওয়া অপরিচিত নরখাদকের জৈবিক লালসার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে। কিন্তু এরপরেও শশীন্দ্র-বিলাসীর জীবন বিচ্ছিন্ন হয় না। শশীন্দ্র জানতেও পারে না কিছু। বিলাসী অবলীলায় সেই দিনের ফসলকে শশীর সন্তান পরিচয় দেয়। কারণ ভিসেকটমি পেশেন্টের সন্তান হয় না এ ধারণা খুব স্পষ্ট নয় তাদের সমাজে। যেকোনো উচ্চবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে অ্যাক্সিডেন্টের মতো ঘটনা ঘটলে তাদের জীবনের তরঙ্গা ঢেউ হয়ে ছিটকে ফেলতে পারত শশীন্দ্র ও বিলাসীর মতো মানুষদের। অথচ শশীর সংসার নিরুদ্বিগ্নভাবে সচল। গণেশ দে'র এদুটো গল্পকে এক সারিতে রেখে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়তো বলা যাবে না, তবুও দুই ভিন্ন সমাজের ভিন্ন পরিসরের পারিবারিক ছবি তাদের ন্যায়-নীতি জীবনবোধ মূল্যবোধের ধারণা কত আলাদা, আর সে সম্পর্কে

লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচনা শেষে গণেশ দে'র লেখনশৈলী সম্পর্কে দু এক কথা না বললেই নয়। তাঁর গল্পের বৈঠকী মেজাজ, মনে হয় যেন তিনি বলে চলেছেন আর কেউ বা কারা তা শুধু শুনে যাচ্ছে। কথনশৈলীর অকারণ জটিলতা, ভাষার পাণ্ডিত্য তাঁর গল্পে পাওয়া যাবে না। মাত্রা বোধ তাঁর গল্পের প্রাণশক্তি বলা যায়। রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রতিরোধের টুকরো টুকরো বিবরণ দিয়েও লেখক মতাদর্শের স্রোতে কলমকে ভেসে যেতে দেননি। অপরিসীম সতর্কতায় কলমের রাশ ধরে রেখেছেন প্রতিটি গল্পে। ছটো ছটো ধারালো বাক্য, শব্দ ব্যবহারের সতর্ক নির্বাচনে তাঁর গল্পের ভঙ্গি অনায়াস গতিতে চলমান। আখ্যানের বিভিন্ন অংশে লেখক সন্তর্পণে প্রবেশ করেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে আর তাই দিয়ে মালা গাঁথেন। বলা যায় আখ্যানই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যঞ্জনা বা ভাষার অলংকরণ গৌণ। তাঁর গল্পে বাহুল্য বর্জন করে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণও রয়েছে। আসলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার জটিলতায় তিনি হারিয়ে যেতে চাননি। 'বন্দরে ফেরা', 'কাঁটা', 'সেগুন কাঠের পালঙ্ক', 'সূর্যেরা নিভে যাচ্ছে' এই গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন থাকলেও মানসিক জটিলতা সৃষ্ট চরিত্র কিংবা আখ্যান কোনোটিই লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গুলি কেউ স্বপ্ন রাজ্যের বাসিন্দা নয় বরং তারা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রোদ বৃষ্টি ঝড় বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। প্রান্তীয় মানুষ, যারা তথাকথিত সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত তাদের প্রেম ক্ষুধা প্রতিবাদ ভাষা খুঁজে পেয়েছে তাঁর গল্পে। এছাড়া রয়েছে লক্ষ্মীপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য চা-বাগানের অন্ধকার জীবনের হাতছানি। আসলে গভীর মমত্ববোধ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে গণেশ দে জীবনের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। তাই দেশকালের সীমা পেরিয়ে তাঁর গল্প আমাদের কাছে ভাঁজ করা কাগজের মতো বিবর্ণ নয় বরং উজ্জ্বল, আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. 'গণেশ দে গল্পসমগ্র', সংকলন ও সম্পাদনা মেঘমালা দে মহন্ত, অসম, যাপন কথা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৯, পৃ. ২২
২. ওই, পৃ. ১৫
৩. ওই, পৃ. ৭৫
৪. ওই, পৃ. ১১০
৫. ওই, পৃ. ১২৭
৬. ওই, পৃ. ১০৯

লেখক পরিচিতি: সঙ্গীতা সাহা, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।